আকাশপ্রদীপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

220729

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

শিরোনামসূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কল্যাণ

বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি, তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনি নি। তাই, আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আকাশপ্রদীপ

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।
দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা
নয়ন ছলোছলো,
এবার তবে ঘরের প্রদীপ
বাইরে নিয়ে চলো।
মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা
আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।
পাণ্ডু আঁধার বিদায়-রাতের শেষে
যে তাকাতো শিশিরসজল শূন্যতা -উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে-
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

২৪।৯।৩৮

[শান্তিনিকেতন]

ভূমিকা

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।
এই দাবি
জীবনের এ ছেলেমানুষি,
মরণেরে বঞ্চিবার ভান ক'রে খুশি,
বাঁচা-মরা খেলাটাতে জিতিবার শখ,
তাই মন্ত্র প'ড়ে আনে কল্পনার বিচিত্র কুহক।
কালস্রোতে বস্তুমূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে।
'রহিল' বলিয়া যায় অদৃশ্যের পানে ;
মৃত্যু যদি করে তার প্রতিবাদ, নাহি আসে কানে।
আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে,
এ কথা বিলয়দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

১৬।৩।৩৯
[শান্তিনিকেতন]

যাত্রাপথ

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে বই পেতুম হাতে
ঝুঁকে প'ড়ে যেতুম প'ড়ে তাহার পাতে পাতে।
কিছু বুঝি, নাই বা কিছু বুঝি,
কিছু না হোক পুঁজি,
হিসাব কিছু না থাক্ নিয়ে লাভ অথবা ক্ষতি,
অল্প তাহার অর্থ ছিল, বাকি তাহার গতি।
মনের উপর ঝরনা যেন চলেছে পথ খুঁড়ি,
কতক জলের ধারা আবার কতক পাথর নুড়ি।
সব জড়িয়ে ক্রমে ক্রমে আপন চলার বেগে
পূর্ণ হয়ে নদী ওঠে জেগে।
শক্ত সহজ এ সংসারটা যাহার লেখা বই
হালকা ক'রে বুঝিয়ে সে দেয় কই।
বুঝছি যত খুঁজছি তত, বুঝছি নে আর ততই,
কিছু বা হাঁ, কিছু বা না, চলছে জীবন স্বতই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,
দিদিমায়ের বালিশ-তলায় চাপা।
আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগী তাহার মলাট
দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।

মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।
অনেক কথা হয় নি তখন বোঝা,
যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—
ভালোমন্দে লড়াই অনিঃশেষ,
প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।
বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ
সামনে এল, রইনু বসে চুপ।

শুরু হতে এইটে গেল বোঝা,
হয়তো বা এক বাঁধা রাস্তা কোথাও আছে সোজা,
যখন-তখন হঠাৎ সে যায় ঠেকে,
আন্দাজে যায় ঠিকানাটা বিষম এঁকেবেঁকে।
সব-জানা দেশ এ নয় কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।
সদাগরের পুত্র সেও যায় অজানার পার
খোঁজ নিতে কোন্ সাত-রাজা-ধন গোপন মানিকটার।
কোটালপুত্র খোঁজে এমন গুহায়-থাকা চোর
যাকে ধরলে সকল চুরির কাটবে বাঁধন-ডোর।

৯।৬।৩৭

[আলমোড়া]

স্কুল-পালানে

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটিতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।
পুরোনো আমড়াগাছ হেলে আছে
পাঁচিলের কাছে,
দীর্ঘ আয়ু বহন করিছে তার
পুঞ্জিত নিঃশব্দ স্মৃতি বসন্তবর্ষার।
লোভ করি নাই তার ফলে,
শুধু তার তলে
সে সঙ্গরহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।
পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম
জানি না তাহার কোনো নাম ;
হয়তো সে আদিম প্রাণের
আতিথ্যদানের
নিঃশব্দ আহ্বান,
যে প্রথম প্রাণ

একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে
মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।
সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিতগতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।
বিনা কাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
ছায়ায় একাকী,
আলস্যের উৎস হতে
চৈতন্যের বিবিধ দিগ্‌বাহী স্রোতে
আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।
প্রাণে মিলাইতে প্রাণ
সে বয়সে নাহি ছিল ব্যবধান ;
নিরুদ্ধ করে নি পথ ভাবনার স্তূপ ;
গাছের স্বরূপ

সহজে অন্তর মোর করিত পরশ।
অনাদৃত সে বাগান চায় নাই যশ
উদ্যানের পদবীতে।
তারে চিনাইতে
মালীর নিপুণতার প্রয়োজন কিছু ছিল নাকো।
যেন কী আদিম সাঁকো
ছিল মোর মনে
বিশ্বের অদৃশ্য পথে যাওয়ার আসার প্রয়োজনে।

কুলগাছ দক্ষিণে কুয়োর ধারে,
পুবদিকে নারিকেল সারে সারে,
বাকি সব জঙ্গল আগাছা।
একটা লাউয়ের মাচা
কবে যত্নে ছিল কারো, ভাঙা চিহ্ন রেখে গেছে পাছে।
বিশীর্ণ গোলকচাঁপা-গাছে
পাতাশূন্য ডাল
অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো। বাঁধানো চাতাল ;
ফাটাফুটো মেঝে তার, তারি থেকে
গরিব লতাটি যেত চোখে-না-পড়ার ফুলে ঢেকে
পাঁচিল ছ্যাৎলা-পড়া
ছেলেমি খেয়ালে যেন রূপকথা গড়া

স্কুল-পালানে

কালের-লেখনী-টানা নানামত ছবির ইঙ্গিতে,
সবুজে পাটলে আঁকা কালো সাদা রেখার ভঙ্গিতে।
সদ্য ঘুম থেকে জাগা
প্রতি প্রাতে নূতন করিয়া ভালো-লাগা
ফুরাতো না কিছুতেই।
কিসে যে ভরিত মন সে তো জানা নেই।
কোকিল দোয়েল টিয়ে এ বাগানে ছিল না কিছুই,
কেবল চড়ুই,
আর ছিল কাক।
তার ডাক
সময় চলার বোধ
মনে এনে দিত। দশটা বেলার রোদ
সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে
দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে।
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গি, চাতুরী সতর্ক আঁখিকোণে,
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে—
এ রিক্ত বাগানটিরে দিয়েছিল বিশেষ কী দাম।
দেখিতাম, আবছায়া ভাবনায় ভালোবাসিতাম।

১৪।১০।৩৮

[শান্তিনিকেতন]

ধ্বনি

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া,
চারি দিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।
বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ণ সুরে,
নির্জন দুপুরে,
রৌদ্রের প্লাবনে যবে চারি ধার
সময়েরে করে দিত একাকার
নিষ্কর্ম তন্দ্রার তলে।
ও পাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহকোলাহলে
মনেরে জাগাতো মোর অনির্দিষ্ট ভাবনার পারে
অস্পষ্ট সংসারে।
ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগ্‌দাদের বসোরার
পরদেশী পসরার

স্বপ্ন এনে দিত বহি।
রহি রহি
রাস্তা হতে শোনা যেত সহিসের ডাক ঊর্ধ্বস্বরে,
অন্তরে অন্তরে
দিত সে ঘোষণা কোন্‌ অস্পষ্ট বার্তার,
অসম্পন্ন উধাও যাত্রার।
একঝাঁক পাতিহাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চকলভাষ
পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাতো আলোর কিলিবিলি।
বেলা হলে
হলদে গামছা কাঁধে হাত দোলাইয়া যেত চলে
কোন্‌খানে কে যে।
ইস্কুলে উঠিত ঘণ্টা বেজে।
সে ঘণ্টার ধ্বনি
নিরর্থ আহ্বান-ঘাতে কাঁপাইত আমার ধমনী।
রৌদ্রক্লান্ত ছুটির প্রহরে
আলস্যে-শিথিল শান্তি ঘরে ঘরে ;

দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীরমন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র-খেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী।
বাতায়নকোণে
নির্বাসনে
যবে দিন যেত বয়ে
না-চেনা ভুবন হতে ভাষাহীন নানা ধ্বনি লয়ে
প্রহরে প্রহরে দূত ফিরে ফিরে
আমারে ফেলিত ঘিরে।
জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ পৃথ্বীনাট্যশালে
তালে ও বেতালে
করিত চরণপাত,
কভু অকস্মাৎ,
কভু মৃদুবেগে ধীরে,
ধ্বনিরূপে মোর শিরে
স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।

ধ্বনি

চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,
শুধু যেথা কত কী যে হয়—
কেন হয় কিসে হয় সে প্রশ্নের কোনো
নাহি মেলে উত্তর কখনো।
যেথা আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল যেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

২১।১০।৩৮

[শান্তিনিকেতন]

বধূ

ঠাকুরমা দ্রুততালে ছড়া যেত প'ড়ে—
ভাবখানা মনে আছে— 'বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে
আম-কাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারীমন্ত্র আগমনীগানে
ছন্দের লাগালো দোল আধোজাগা কল্পনার শিহরদোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।
ছড়া-বাঁধা চতুর্দোলা চলেছিল যে গলি বাহিয়া
চিহ্নিত করেছে মোর হিয়া
গভীর নাড়ীর পথে অদৃশ্য রেখায় এঁকেবেঁকে।
তারি প্রান্ত থেকে
অশ্রুত সানাই বাজে অনিশ্চিত প্রত্যাশার সুরে
দুর্গম চিন্তার দূরে দূরে।
সেদিন সে কল্পলোকে বেহারাগুলোর পদক্ষেপে
বক্ষ উঠেছিল কেঁপে কেঁপে,

পলে পলে ছন্দে ছন্দে আসে তারা আসে না তবুও,
পথ শেষ হবে না কভুও।

সেকাল মিলালো। তার পরে, বধূ-আগমনগাথা
গেয়েছে মর্মরচ্ছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা;
বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে;
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।
অতিদূর মায়াময়ী বধূর নূপুরে
তন্দ্রার প্রত্যন্তদেশে জাগায়েছে ধ্বনি
মৃদু রণরণি।
ঘুম ভেঙে উঠেছিনু জেগে,
পূর্বাকাশে রক্ত মেঘে
দিয়েছিল দেখা
অনাগত চরণের অলক্তের রেখা।
কানে কানে ডেকেছিল মোরে
অপরিচিতার কণ্ঠ স্নিগ্ধ নাম ধ'রে—
সচকিতে
দেখে তবু পাই নি দেখিতে।

আকাশপ্রদীপ

অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহে মনে জাগালো হরষ ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই,
'তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন্ ঘাট হতে
এসেছ আলোতে !'
উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ ;
ইঙ্গিতে জানায়েছিল, 'আমি তারি দূত,
সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে
যার নাম লেখা রহিয়াছে
অনাদি অজ্ঞাত যুগে সে চড়েছে তার চতুর্দোলা,
ফিরিছে সে চির পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'

২৫।১০।৩৮
[শান্তিনিকেতন]

জল

ধরাতলে
চঞ্চলতা সব আগে নেমেছিল জলে।
সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল জেগে
তারি স্রোতোবেগে।
তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
কলোল্লোলে উদ্‌বেল উচ্ছল
শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার,
নৃত্যহীন ঔদাসীন্যে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তার।
গান নাই, শব্দের তরণী হোথা ডোবা,
প্রাণ হোথা বোবা।
জীবনের রঙ্গমঞ্চে ওখানে রয়েছে পর্দা টানা,
ওইখানে কালো বরনের মানা।
ঘটনার স্রোত নাহি বয়,
নিস্তব্ধ সময়।
হোথা হতে তাই মনে দিত সাড়া
সময়ের বন্ধ-ছাড়া
ইতিহাস-পলাতক কাহিনীর কত
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি নানামত।
উপরের তলা থেকে
চেয়ে দেখে

না-দেখা গভীরে ওর মায়াপুরী এঁকেছিনু মনে।
নাগকন্যা মানিকদর্পণে
সেথায় গাঁথিছে বেণী,
কুঞ্চিত লহরিকার শ্রেণী
ভেসে যায় বেঁকে বেঁকে
যখন বিকেলে হাওয়া জাগিয়া উঠিত থেকে থেকে।
তীরে যত গাছপালা পশুপাখি
তারা আছে অন্যলোকে, এ শুধু একাকী।
তাই সব
যত কিছু অসম্ভব
কল্পনার মিটাইত সাধ,
কোথাও ছিল না তার প্রতিবাদ।

তার পরে মনে হল একদিন,
সাঁতারিতে পেল যারা পৃথিবীতে তারাই স্বাধীন,
বন্দী তারা যারা পায় নাই।
এ আঘাত প্রাণে নিয়ে চলিলাম তাই
ভূমির নিষেধগণ্ডি হতে পার।
অনাত্মীয় শত্রুতার
সংশয় কাটিল ধীরে ধীরে,
জলে আর তীরে

আমারে মাঝেতে নিয়ে হল বোঝাপড়া।
আঁকড়িয়া সাঁতারের ঘড়া
অপরিচয়ের বাধা উত্তীর্ণ হয়েছি দিনে দিনে,
অচেনার প্রান্তসীমা লয়েছিনু চিনে।
পুলকিত সাবধানে
নামিতাম স্নানে,
গোপন তরল কোন্ অদৃশ্যের স্পর্শ সর্ব গায়ে
ধরিত জড়ায়ে।
হর্ষ-সাথে মিলি ভয়
দেহময়
রহস্য ফেলিত ব্যাপ্ত করি।

পূর্বতীরে বৃদ্ধ বট প্রাচীন প্রহরী
গ্রন্থিল শিকড়গুলো কোথায় পাঠাতো নিরালোকে
যেন পাতালের নাগলোকে।
এক দিকে দূর আকাশের সাথে
দিনে রাতে
চলে তার আলোকছায়ার আলাপন,
অন্য দিকে দূরনিঃশব্দের তলে নিমজ্জন
কিসের সন্ধানে
অবিচ্ছিন্ন প্রচ্ছন্নের পানে।

সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়,
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায় ;
তার পরে দেখিলাম এ পুকুর এও বাতায়ন—
এক দিকে সীমা বাঁধা, অন্য দিকে মুক্ত সারাক্ষণ।
করিয়াছি পারাপার
যত শত বার
ততই এ তটে-বাঁধা জলে
গভীরের বক্ষতলে
লভিয়াছি প্রতি ক্ষণে বাধা-ঠেলা স্বাধীনের জয়,
গেছে চলি ভয়।

২৬।১০।৩৮
[শান্তিনিকেতন]

শ্যামা

উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ, গলায় পলার হারখানি।
চেয়েছি অবাক মানি
তার পানে।
বড়ো বড়ো কাজল নয়ানে
অসংকোচে ছিল চেয়ে
নবকৈশোরের মেয়ে,
ছিল তারি কাছাকাছি বয়স আমার।
স্পষ্ট মনে পড়ে ছবি। ঘরের দক্ষিণে খোলা দ্বার,
সকালবেলার রোদে বাদামগাছের মাথা
ফিকে আকাশের নীলে মেলেছে চিকন ঘন পাতা।
একখানি সাদা শাড়ি কাঁচা কচি গায়ে,
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে।
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে,
ছুটির মধ্যাহ্নে পড়া কাহিনীর পাতে
ওই মূর্তিখানি ছিল। ডেকেছে সে মোরে মাঝে মাঝে
বিধির খেয়াল যেথা নানাবিধ সাজে
রচে মরীচিকালোক নাগালের পারে
বালকের স্বপ্নের কিনারে।
দেহ ধরি মায়া
আমার শরীরে মনে ফেলিল অদৃশ্য ছায়া

সূক্ষ্মস্পর্শময়ী।
সাহস হল না কথা কই।
হৃদয় ব্যথিল মোর অতিমৃদুগুঞ্জরিত সুরে—
ও যে দূরে, ও যে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।

একদিন পুতুলের বিয়ে,
পত্র গেল দিয়ে।
কলরব করেছিল হেসে খেলে
নিমন্ত্রিত-দল। আমি মুখচোরা ছেলে
এক পাশে সংকোচে পীড়িত। সন্ধ্যা গেল বৃথা—
পরিবেশনের ভাগে পেয়েছিনু মনে নেই কী তা।
দেখেছিনু দ্রুতগতি দুখানি পা আসে যায় ফিরে,
কালো পাড় নাচে তারে ঘিরে।
কটাক্ষে দেখেছি তার কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা। অনুরোধ উপরোধ
শুনেছিনু তার স্নিগ্ধ স্বরে।
ফিরে এসে ঘরে
মনে বেজেছিল তারি প্রতিধ্বনি
অর্ধেক রজনী।

তার পরে একদিন
জানাশোনা হল বাধাহীন।
একদিন নিয়ে তার ডাকনাম
তারে ডাকিলাম।
একদিন ঘুচে গেল ভয়,
পরিহাসে পরিহাসে হল দোঁহে কথা-বিনিময়।
কখনো বা গড়ে-তোলা দোষ
ঘটায়েছে ছল-করা রোষ।
কখনো বা শ্লেষবাক্যে নিষ্ঠুর কৌতুক
হেনেছিল দুখ।
কখনো বা দিয়েছিল অপবাদ
অনবধানের অপরাধ।
কখনো দেখেছি তার অযত্নের সাজ—
রন্ধনে ছিল সে ব্যস্ত, পায় নাই লাজ—
পুরুষসুলভ মোর কত মূঢ়তারে
ধিক্কার দিয়েছে নিজ স্ত্রীবুদ্ধির তীব্র অহংকারে।
একদিন বলেছিল, 'জানি হাত দেখা।'
হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গণেছিল রেখা—
বলেছিল, 'তোমার স্বভাব—
প্রেমের লক্ষণে দীন।' দিই নাই কোনোই জবাব।
পরশের সত্য পুরস্কার
খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না-পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়

পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিমে দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো,
আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশে স্বপ্নেতে বোঝাই।

৩১।১০।৩৮
[শান্তিনিকেতন]

পঞ্চমী

ভাবি বসে বসে
গত জীবনের কথা,
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে
যাক-গে সে কথা যাক-গে

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।
কৃপণ কৃপার ভাঙা কণা একটুক
মনে দেয় নাই সুখ।
সে যুগের শেষে আজ বলি হেসে,
কম কি সে কৌতুক
যতটুকু ছিল ভাগ্যে,
দুঃখের কথা থাক্-গে।

পঞ্চমী তিথি
বনের আড়াল থেকে
দেখা দিয়েছিল
ছায়া দিয়ে মুখ ঢেকে।
মহা আক্ষেপে বলেছি সেদিন
এ ছল কিসের জন্য।

পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি—
সিকি চাঁদিনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।
বলি আরবার এসো পঞ্চমী, এসো,
চাপা হাসিটুকু হেসো,
আধখানি বেঁকে ছলনায় ঢেকে
না জানিয়ে ভালোবেসো।
দয়া, ফাঁকি নামে গণ্য,
অমারে করুক ধন্য।

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি-

দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় এ কী, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস্য।

ভাগ্যের হাসি কৌতুক করি
সেদিন সে কোন্ ছলে
আপনার ছবি দেখিতে চাহিল
আমার অশ্রুজলে।
এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি
পালা শেষ করো আসি।
মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি।
আজ করো তারি ভাষ্য
যা ছিল অবিশ্বাস্য।

বয়স গিয়েছে,
হাসিবার ক্ষমতাটি
বিধাতা দিয়েছে,
কুয়াশা গিয়েছে কাটি।

দুঃখদুর্দিন কালো বরনের
মুখোশ করেছে ছিন্ন

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি।
সেথা হতে তার ভূতভবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি।
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে,
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

২৯।১১।৩৮
[শান্তিনিকেতন]

জানা-অজানা

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে, কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না-জানারই মতো।
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সাসির দুখানা কাঁচ ভাঙা ;
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা—
চোখে পড়ে পড়েও না ;
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো সকালে রোদ্দুরে।
সবুজ একটি শাড়ি ডুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা ; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রঙ চোখে উঠেছিল নেচে,
আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু ষোলো-আনা নাই।

থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজপত্তর নানামত,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হল আটই তারিখ। ল্যাভেণ্ডার
শিশিভরা রোদ্দুরের রঙে। দিনরাত
টিক্‌টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আলমারিভরা বই আছে;
ওরা বারো-আনা
পরিচয়-অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, রেখেছিনু কোনো-এক কালে;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন;
আজ অন্যরূপ,
প্রায় তারা চুপ।

আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা একসাথে সম্বন্ধবিহীন

এইটুকু ঘর।
কিছু বা আপন তার, অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।
দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো।
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি 'পরে চলে আনাগোনা।
আয়নাফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, ফিকে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি।
মনে ভাবি, আমি সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের উপাদানে ঠাসা
ঘরের মতন ; ঝাপ্‌সা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার

আকাশপ্রদীপ

যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা ;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে।

১১।৯।৩৮
উদয়ন। শান্তিনিকেতন

প্রশ্ন

বাঁশবাগানের গলি দিয়ে মাঠে
চলতেছিলেম হাটে।
তুমি তখন আনতেছিলে জল,
পড়ল আমার ঝুড়ির থেকে
একটি রাঙা ফল।
হঠাৎ তোমার পায়ের কাছে
গড়িয়ে গেল ভুলে,
নিই নি ফিরে তুলে।
দিনের শেষে দিঘির ঘাটে
তুলতে এলে জল,
অন্ধকারে কুড়িয়ে তখন
নিলে কি সেই ফল।
এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।

৩।১২।৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বঞ্চিত

রাজসভাতে ছিল জ্ঞানী,
ছিল অনেক গুণী।
কবির মুখে কাব্যকথা শুনি
ভাঙল দ্বিধার বাঁধ,
সমস্বরে জাগল সাধুবাদ।
উষ্ণীষেতে জড়িয়ে দিল
মণিমালার মান,
স্বয়ং রাজার দান।
রাজধানীময় যশের বন্যাবেগে
নাম উঠল জেগে।

দিন ফুরালো। খ্যাতিক্লান্তমনে
যেতে যেতে পথের ধারে
দেখল বাতায়নে
তরুণী সে— ললাটে তার
কুঙ্কুমেরই ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা।

বঞ্চিত

সামনে পদ্মপাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি—
'এই মালাটি নয় তো আমার তরে'।

৩।১২।৩৮
[শান্তিনিকেতন]

আমগাছ

এ তো সহজ কথা,
অঘ্রানে এই স্তব্ধ নীরবতা
জড়িয়ে আছে সামনে আমার
আমের গাছে ;
কিন্তু ওটাই সবার চেয়ে
দুর্গম মোর কাছে।
বিকেল বেলার রোদ্দুরে এই চেয়ে থাকি,
যে রহস্য ওই তরুটি রাখল ঢাকি
গুঁড়িতে তার ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কাঁপনলাগা তালে
সে কোন্ ভাষা আলোর সোহাগ
শূন্যে বেড়ায় খুঁজি।
মর্ম তাহার স্পষ্ট নাহি বুঝি,
তবু যেন অদৃশ্য তার চঞ্চলতা
রক্তে জাগায় কানে-কানে কথা,
মনের মধ্যে বুলায় যে অঙ্গুলি
আভাস-ছোঁয়া ভাষা তুলি
সে এনে দেয় অস্পষ্ট ইঙ্গিত
বাক্যের অতীত।

আমগাছ

ওই যে বাকলখানি
রয়েছে ওর পর্দা টানি
ওর ভিতরের আড়াল থেকে আকাশ-দূতের সাথে
বলা-কওয়া কী হয় দিনে রাতে,
পরের মনের স্বপ্নকথার সম
পৌঁছবে না কৌতূহলে মম।
দুয়ার-দেওয়া যেন বাসরঘরে
ফুলশয্যার গোপন রাতে কানাকানি করে,
অনুমানেই জানি,
আভাসমাত্র না পাই তাহার বাণী।
ফাগুন আসে বছরশেষের পারে
দিনে-দিনেই খবর আসে দ্বারে।
একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হতে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।
অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।

৫।১২।৩৮

পাখির ভোজ

ভোরে উঠেই পড়ে মনে
মুড়ি খাবার নিমন্ত্রণে
আসবে শালিখ পাখি।
চাতাল-কোণে বসে থাকি,
ওদের খুশি দেখতে লাগে ভালো।
স্নিগ্ধ আলো
এ অঘ্রানের শিশির-ছোঁওয়া প্রাতে,
সরল লোভে চপল পাখির চটুল নৃত্য-সাথে
শিশুদিনের প্রথম হাসি মধুর হয়ে মেলে—
চেয়ে দেখি সকল কর্ম ফেলে।
জাড়ের হাওয়ায় ফুলিয়ে ডানা
একটুকু মুখ ঢেকে
অতিথিরা থেকে থেকে
লাল্‌চে কালো সাদা রঙের পরিচ্ছন্ন বেশে
দেখা দিচ্ছে এসে।

খানিক পরেই একে একে জোটে পায়রাগুলো,
বুক ফুলিয়ে হেলে-দুলে খুঁটে খুঁটে ধুলো
খায় ছড়ানো ধান।

ওদের সঙ্গে শালিখদলের পঙ্‌ক্তি-ব্যবধান
একটুমাত্র নেই।
পরস্পরে এক-সমানেই
ব্যস্ত পায়ে বেড়ায় প্রাতরাশে।
মাঝে-মাঝে কী অকারণ ত্রাসে
ত্রস্ত পাখা মেলে
এক মুহূর্তে যায় উড়ে ধান ফেলে।
আবার ফিরে আসে
অহেতু আশ্বাসে।

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
একটুখানি যাচ্ছে সরে আসছে আবার কাছে,
উড়ে গিয়ে বসছে তেঁতুলগাছে।
বাঁকিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।
এবার মনে হয়
এতক্ষণে পরস্পরের ভাঙল সমন্বয়।
কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।
প্রথম হল মনে,
তাড়িয়ে দেব ; লজ্জা হল তারি পরক্ষণে—

পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি লাগছে না আর মন্দ,
সকালবেলার ভোজের সভায়
কাকের নাচের ছন্দ।

এই-যে বহায় ওরা
প্রাণস্রোতের পাগ্‌লাঝোরা,
কোথা হতে অহরহ আসছে নাবি
সেই কথাটাই ভাবি।
এই খুশিটার স্বরূপ কী যে, তারি
রহস্যটা বুঝতে নাহি পারি।
চটুলদেহ দলে দলে
দুলিয়ে তোলে যে আনন্দ খাদ্যভোগের ছলে,
এ তো নহে এই নিমেষের সদ্য চঞ্চলতা,
অগণ্য এ কত যুগের অতি প্রাচীন কথা।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে, হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশির মৃত্যুরন্ধ্রে সেইমতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।

পাখির ভোজ

আলোক যেমন অলক্ষ্য কোন সুদূর কেন্দ্র হতে
অবিশ্রান্ত স্রোতে
নানা রূপের বিচিত্র সীমায়
ব্যক্ত হতে থাকে নিত্য নানা ভঙ্গে নানা রঙ্গিমায়
তেমনি যে এই সত্তার উচ্ছ্বাস
চতুর্দিকে ছড়িয়ে ফেলে নিবিড় উল্লাস—
যুগের পরে যুগে তবু হয় না গতিহারা,
হয় না ক্লান্ত অনাদি সেই ধারা।
সেই পুরাতন অনির্বচনীয়
সকালবেলায় রোজ দেখা দেয় কি ও
আমার চোখের কাছে
ভিড়-করা ওই শালিখগুলির নাচে!
আদিমকালের সেই আনন্দ ওদের নৃত্যবেগে
রূপ ধ'রে মোর রক্তে ওঠে জেগে।
তবুও দেখি কখন কদাচিৎ
বিরূপ বিপরীত—
প্রাণের সহজ সুষমা যায় ঘুচি,
চঞ্চুতে চঞ্চুতে খোঁচাখুচি;
পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত-অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে।
দেখেছি সেই জীবন-বিরুদ্ধতা,
হিংসার ক্রুদ্ধতা—

যেমন দেখি কুহেলিকার কুশ্রী অপরাধ,
শীতের প্রাতে আলোর প্রতি কালোর অপবাদ—
অহংকৃত ক্ষণিকতার অলীক পরিচয়,
অসীমতার মিথ্যা পরাজয়।
তাহার পরে আবার করে ছিন্নেরে গ্রন্থন
সহজ চিরন্তন।
প্রাণোৎসবে অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি।

৬।১২।৩৮
শ্যামলী। শান্তিনিকেতন

বেজি

অনেক দিনের এই ডেস্কো—
আনমনা কলমের কালী-পড়া ফ্রেস্কো
দিয়েছে বিস্তর দাগ ভুতুড়ে রেখার।
যমজ সোদর ওরা যে-সব লেখার
ছাপার লাইনে পেল ভদ্রবেশে ঠাঁই,
তাদের স্মরণে এরা নাই।
অক্সফোর্ড্ ডিক্সনারি, পদকল্পতরু,
ইংরেজ মেয়ের লেখা 'সাহারার মরু'
ভ্রমণের বই, ছবি আঁকা—
এগুলোর এক পাশে চা রয়েছে ঢাকা
পেয়ালায়, মডার্‌ন্ রিভিয়ুতে চাপা।
পড়ে আছে সদ্যছাপা
প্রুফগুলো কুঁড়েমির উপেক্ষায়।
বেলা যায়,
ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে পাঁচ,
বৈকালী ছায়ার নাচ
মেঝেতে হয়েছে শুরু, বাতাসে পর্দায় লেগে দোলা।
খাতাখানি আছে খোলা।—
আধঘণ্টা ভেবে মরি,
প্যান্থীজ্‌ম্ শব্দটাকে বাংলায় কী করি।

পোষা বেজি হেনকালে দ্রুতগতি এখানে সেখানে
টেবিল চৌকির নীচে ঘুরে গেল কিসের সন্ধানে—
দুই চক্ষু ঔৎসুক্যের দীপ্তি-জ্বলা,
তাড়াতাড়ি দেখে গেল আলমারির তলা
দামী দ্রব্য যদি কিছু থাকে
ঘ্রাণ কিছু মিলিল না তীক্ষ্ণ নাকে
ঈপ্সিত বস্তুর। ঘুরে ফিরে অবজ্ঞায় গেল চলে—
এ ঘরে সকলি ব্যর্থ আরস্‌লার খোঁজ নেই ব'লে।

আমার কঠিন চিন্তা এই,
প্যান্থীজ্‌ম্‌ শব্দটার বাংলা বুঝি নেই।

৪ অক্টোবর ১৯৩৮
[শান্তিনিকেতন]

যাত্রা

ইস্টিমারের ক্যাবিনটাতে কবে নিলেম ঠাঁই,
স্পষ্ট মনে নাই।
উপরতলার সারে
কামরা আমার একটা ধারে।
পাশাপাশি তারি
আরো ক্যাবিন সারি সারি
নম্বরে চিহ্নিত,
একই রকম খোপ সেগুলোর দেয়ালে ভিন্নিত
সরকারী যা আইনকানুন তাহার যাথাযথ্য
অটুট, তবু যাত্রীজনের পৃথক বিশেষত্ব
রুদ্ধদুয়ার ক্যাবিনগুলোয় ঢাকা,
এক চলনের মধ্যে চালায় ভিন্ন ভিন্ন চাকা,
ভিন্ন ভিন্ন চাল।
অদৃশ্য তার হাল,
অজানা তার লক্ষ্য হাজার পথেই,
সেথায় কারো আসনে ভাগ হয় না কোনোমতেই।
প্রত্যেকেরই রিজার্ভ্‌-করা কোটর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ;
দরজাটা খোলা হলেই সম্মুখে সমুদ্র
মুক্ত চোখের 'পরে
সমান সবার তরে,

তবুও সে একান্ত অজানা,
তরঙ্গতর্জনী-তোলা অলঙ্ঘ্য তার মানা।

মাঝে মাঝে ঘণ্টা পড়ে। ডিনার টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে,
তারি সঙ্গে নানা রঙের সাজে
ইলেক্‌ট্রিকের আলো -জ্বালা কক্ষমাঝে
একটু জানা অনেকখানি না-জানাতেই মেশা—
চক্ষু কানের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা।
কিছুক্ষণের তরে
মোহাবেশে ঘনিয়ে সবায় ধরে।
চেনাশোনা হাসি-আলাপ মদের ফেনার মতো
বুদ্‌বুদিয়া ওঠে আবার গভীরে হয় গত।
বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়,
ফেনিল সুনীল তেপান্তরে মরণ-ঘেরা ভয়।

হঠাৎ কেন খেয়াল গেল মিছে,
জাহাজখানা ঘুরে আসি উপর থেকে নীচে।
খানিক যেতেই পথ হারালুম, গলির আঁকেবাঁকে
কোথায় ওরা কোন্ অফিসার থাকে।

কোথাও দেখি সেলুনঘরে ঢুকে
ক্ষুর বোলাচ্ছে নাপিত সে কার ফেনায়-মগ্ন মুখে!
হোথায় রান্নাঘর ;
রাঁধুনেরা সার বেঁধেছে পৃথুল-কলেবর।
গা ঘেঁষে কে গেল চলে ড্রেসিং-গাউন-পরা,
স্নানের ঘরে জায়গা পাবার ত্বরা।
নীচের তলার ডেকের 'পরে কেউ বা করে খেলা,
ডেক-চেয়ারে কারো শরীর মেলা,
বুকের উপর বইটা রেখে কেউ বা নিদ্রা যায়,
পায়চারি কেউ করে ত্বরিত পায়।
স্টুয়ার্ড্ হোথায় জুগিয়ে বেড়ায় বরফী শর্বৎ।
আমি তাকে শুধাই আমার ক্যাবিন ঘরের পথ
নেহাত থতোমতো।
সে শুধালো, নম্বর তার কত।
আমি বললেম যেই
নম্বরটা মনে আমার নেই—
একটু হেসে নিরুত্তরে গেল আপন কাজে,
ঘেমে উঠি উদ্‌বেগে আর লাজে।
আবার ঘুরে বেড়াই আগে পাছে,
চেয়ে দেখি কোন্ ক্যাবিনের নম্বর কী আছে।
যেটাই দেখি মনেতে হয় এইটে হতে পারে,
সাহস হয় না ধাক্কা দিতে দ্বারে।

ভাবছি কেবল কী যে করি, হোলো আমার এ কী,
এমন সময় হঠাৎ চমকে দেখি
নিছক স্বপ্ন এ যে,
এক যাত্রার যাত্রী যারা কোথায় গেল কে যে।

গভীর রাত্রি ; বাতাস লেগে কাঁপে ঘরের সাসি,
রেলের গাড়ি অনেক দূরে বাজিয়ে গেল বাঁশি।

২৬।২।৩৯
[শান্তিনিকেতন]

সময়হারা

খবর এল— সময় আমার গেছে,
আমার-গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই।
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে
উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো,
টানছে ধুলো।
হাল আমলের ছাড়পত্রহীন
অকিঞ্চনটা লুকিয়ে কাটায় জোড়াতাড়ার দিন।
ভাঙা দেয়াল ঢেকে একটা ছেঁড়া পর্দা টাঙাই ;
ইচ্ছে করে পৌষমাসের হাওয়ার তোড়টা ভাঙাই ;
ঘুমোই যখন ফড়্‌ফড়িয়ে বেড়ায় সেটা উড়ে,
নিতান্ত ভুতুড়ে।
আধ-পেটা খাই শালুক-পোড়া ; একলা কঠিন ভুঁয়ে
চেটাই পেতে শুয়ে
ঘুম হারিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আউড়ে চলি শুধু্‌ আপন-মনে—
'উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব, কাগমারে দই।'

আমার চেয়ে কম ঘুমন্ত নিশাচরের দল
খোঁজ নিয়ে যায় ঘরে এসে, হায় সে কী নিষ্ফল।
কখনো বা হিসেব ভুলে আসে মাতাল চোর—
শূন্য ঘরের পানে চেয়ে বলে, 'সাঙাত মোর,
আছে ঘরে ভদ্র ভাষায় বলে যাকে দাওয়াই ?'
নেই কিছু তো, দু-এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াই।
একটু যখন আসে ঘুমের ঘোর
সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর।
দুপুরবেলায় বেকার থাকি অন্যমনা ;
গিরগিটি আর কাঠবিড়ালির আনাগোনা
সেই দালানের বাহির ঝোপে ;
থামের মাথায় খোপে খোপে
পায়রাগুলোর সারাটা দিন বকম্-বকম্।
আঙিনাটার ভাঙা পাঁচিল, ফাটলে তার রকম-রকম
লতাগুল্ম পড়ছে ঝুলে,
হলদে সাদা বেগনি ফুলে
আকাশ-পানে দিচ্ছে উঁকি।
ছাতিমগাছের মরা শাখা পড়ছে ঝুঁকি
শঙ্খমণির খালে,
মাছরাঙারা দুপুরবেলায় তন্দ্রানিঝুম কালে
তাকিয়ে থাকে গভীর জলের রহস্য-ভেদ-রত
বিজ্ঞানীদের মতো।

পানাপুকুর, ভাঙনধরা ঘাট,
অফলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট।
চক্ষু বুজে ছবি দেখি— কাৎলা ভেসেছে,
বড়োসাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে।
ঝাউগুঁড়িটার 'পরে
কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠকিয়ে কেবল প্রশ্ন করে।
আগে কানে পৌঁছত না ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,
এখন যখন পোড়ো বাড়ি দাঁড়িয়ে হতবাক্‌
ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা-সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে।
আঁধার হতে না হতে সব শেয়াল ওঠে ডেকে
কল্‌মিদিঘির ভাঙা পাড়ির থেকে।
পেঁচার ডাকে বাঁশের বাগান হঠাৎ ভয়ে জাগে,
তন্দ্রা ভেঙে বুকে চমক লাগে।
বাদুড়-ঝোলা তেঁতুলগাছে মনে যে হয় সত্যি
দাড়িওয়ালা আছে ব্রহ্মদত্যি।
রাতের বেলায় ডোমপাড়াতে কিসের কাজে
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।
তখন ভাবি, একলা ব'সে দাওয়ার কোণে
মনে-মনে,
ঝড়েতে কাত জারুলগাছের ডালে ডালে
পিরভু নাচে হাওয়ার তালে।

শহর জুড়ে নামটা ছিল, যেদিন গেল ভাসি
হলুম বনগাঁবাসী।
সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে।
সজনেগাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
গোধূলিতে সুয্যিমামার বিয়ে ;
মামি থাকেন, সোনার বরন ঘোমটাতে মুখ ঢাকা,
আলতা পায়ে আঁকা।
এইখানেতে ঘুঘুডাঙার খাঁটি খবর মেলে
কুলতলাতে গেলে।
সময় আমার গেছে বলেই জানার সুযোগ হল,
'কলুদ ফুল' যে কাকে বলে, ওই যে থোলো থোলো
আগাছা জঙ্গলে
সবুজ অন্ধকারে যেন রোদের টুকরো জ্বলে।
বেড়া আমার সব গিয়েছে টুটে ;
পরের গোরু যেখান থেকে যখন খুশি ছুটে
হাতার মধ্যে আসে ;
আর কিছু তো পায় না, খিদে মেটায় শুকনো ঘাসে।
আগে ছিল সাটিন্ বীজে বিলিতি মৌসুমি,
এখন মরুভূমি।
সাত পাড়াতে সাত কুলেতে নেইকো কোথাও কেউ
মনিব যেটার, সেই কুকুরটা কেবলি ঘেউ-ঘেউ

লাগায় আমার দ্বারে, আমি বোঝাই তারে কত
আমার ঘরে তাড়িয়ে দেবার মতো
ঘুম ছাড়া আর মিলবে না তো কিছু—
শুনে সে লেজ নাড়ে, সঙ্গে বেড়ায় পিছু পিছু।
অনাদরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে পিঠের 'পরে
জানিয়ে দিলে লক্ষ্মীছাড়ার জীর্ণ ভিটার 'পরে
অধিকারের দলিল তাহার দেহেই বর্তমান।
দুর্ভাগ্যের নতুন হাওয়া-বদল করার স্থান
এমনতরো মিলবে কোথায়। সময় গেছে তারই
সন্দেহ তার নেইকো একেবারেই।
সময় আমার গিয়েছে তাই, গাঁয়ের ছাগল চরাই।
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে।

হাওয়ার ঠেলায় শব্দ করে আগল-ভাঙা দ্বার,
সারা দিনে জনা-মাত্র নেইকো খরিদ্দার।
কালের অলস চরণ-পাতে
ঘাস উঠেছে ঘরে আসার বাঁকা গলিটাতে।
ওরই ধারে বটের তলায় নিয়ে চিঁড়ের থালা
চড়ুইপাখির জন্যে আমার খোলা অতিথশালা।

সন্ধে নামে পাতাঝরা শিমুলগাছের আগায়,
আধ-ঘুমে আধ-জাগায়
মন চলে যায় চিহ্নবিহীন পস্‌টারিটির পথে
স্বপ্নমনোরথে ;
কালপুরুষের সিংহদ্বারের ওপার থেকে
শুনি কে কয় আমায় ডেকে,—
'ওরে পুতুলওলা
তোর যে ঘরে যুগান্তরের দুয়ার আছে খোলা,
সেথায় আগাম-বায়না-নেওয়া খেলনা যত আছে
লুকিয়ে ছিল গ্রহণ-লাগা ক্ষণিক কালের পাছে ;
আজ চেয়ে দেখ, দেখতে পাবি,
মোদের দাবি
ছাপ-দেওয়া তার ভালে।
পুরানো সে নতুন আলোয় জাগল নতুন কালে।
সময় আছে কিংবা গেছে দেখার দৃষ্টি সেই
সবার চক্ষে নেই—
এই কথাটা মনে রেখে ওরে পুতুলওলা,
আপন সৃষ্টি-মাঝখানেতে থাকিস আপন-ভোলা।
ওই-যে বলিস, বিছানা তোর ভুঁয়ে চেটাই পাতা,
ছেঁড়া মলিন কাঁথা—
ওই-যে বলিস, জোটে কেবল সিদ্ধ কচুর পথ্যি—
এটা নেহাৎ স্বপ্ন কি নয়, এ কি নিছক সত্যি !

পাস নি খবর, বাহান্ন জন কাহার
পাল্‌কি আনে— শব্দ কি পাস তাহার ?
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে।
খেলা যে তার বন্ধ আছে তোমার খেলনা বিনে,
এবার নেবে কিনে।
কী জানি বা ভাগ্যি তোমার ভালো,
বাসরঘরে নতুন প্রদীপ জ্বালো ;
নবযুগের রাজকন্যা আধেক-রাজ্য-সুদ্ধ
যদি মেলে, তা নিয়ে কেউ বাধায় যদি যুদ্ধ,
ব্যাপারখানা উচ্চতলায় ইতিহাসের ধাপে
উঠে পড়বে মহাকাব্যের মাপে।
বয়স নিয়ে পণ্ডিত কেউ তর্ক যদি করে
বলবে তাকে— একটা যুগের পরে
চিরকালের বয়স আসে সকল-পাঁজি-ছাড়া,
যমকে লাগায় তাড়া।'

এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র—
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র ;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা !

১।২।৩৯

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন

নামকরণ

একদিন মুখে এল নূতন এ নাম—
চৈতালিপূর্ণিমা ব'লে কেন যে তোমারে ডাকিলাম
সে কথা শুধাও যবে মোরে
স্পষ্ট ক'রে
তোমারে বুঝাই
হেন সাধ্য নাই।
রসনায় রসিয়েছে, আর কোনো মানে
কী আছে কে জানে।
জীবনের যে সীমায়
এসেছ গম্ভীর মহিমায়
সেথা অপ্রমত্ত তুমি,
পেরিয়েছ ফাল্গুনের ভাঙাভাঙা উচ্ছিষ্টের ভূমি,
পৌঁছিয়াছ তপঃশুচি নিরাসক্ত বৈশাখের পাশে,
এ কথাই বুঝি মনে আসে
না ভাবিয়া আগুপিছু।
কিংবা এ ধ্বনির মাঝে অজ্ঞাত কুহক আছে কিছু
হয়তো মুকুল-ঝরা মাসে
পরিণতফলনম্র অপ্রগল্‌ভ যে মর্যাদা আসে

নামকরণ

আম্রডালে,
দেখেছি তোমার ভালে
সে পূর্ণতা স্তব্ধতামন্থর—
তার মৌন-মাঝে বাজে অরণ্যের চরম মর্মর।
অবসন্ন বসন্তের অবশিষ্ট অন্তিম চাঁপায়
মৌমাছির ডানারে কাঁপায়
নিকুঞ্জের ম্লান মৃদু ঘ্রাণে,
সেই ঘ্রাণ একদিন পাঠায়েছ প্রাণে
তাই মোর উৎকণ্ঠিত বাণী
জাগায়ে দিয়েছে নামখানি।
সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
তোমারে গুঞ্জন করি ঘিরে
চারি দিকে,
ধ্বনিলিপি দিয়ে তার বিদায়স্বাক্ষর দেয় লিখে।
তুমি যেন রজনীর জ্যোতিষ্কের শেষ পরিচয়
শুকতারা, তোমার উদয়
অস্তের খেয়ায় চ'ড়ে আসা,
মিলনের সাথে বহি বিদায়ের ভাষা।
তাই বসে একা
প্রথম দেখার ছন্দে ভরি লই সব-শেষ দেখা।
সেই দেখা মম
পরিস্ফুটতম।

বসন্তের শেষমাসে শেষ শুক্লতিথি
তুমি এলে তাহার অতিথি,
উজাড় করিয়া শেষ দানে
ভাবের দাক্ষিণ্য মোর অন্ত নাহি জানে।
ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
চৈত্রের সে ঘন দিন তোমার লাবণ্যে মূর্তি ধরে ;
মিলে যায় সারঙের বৈরাগ্যরাগের শান্তস্বরে,
প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

হয়তো এ-সব ব্যাখ্যা স্বপ্ন-অন্তে চিন্তা ক'রে বলা,
দাম্ভিক বুদ্ধিরে শুধু ছলা—
বুঝি এর কোনো অর্থ নাইকো কিছুই।
জ্যৈষ্ঠ-অবসানদিনে আকস্মিক জুঁই
যেমন চমকি জেগে উঠে
সেইমতো অকারণে উঠেছিল ফুটে,
সেই চিত্রে পড়েছিল তার লেখা
বাক্যের তুলিকা যেথা স্পর্শ করে অব্যক্তের রেখা।
পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার

অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী—
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি—
যাহা পায় তার সাথে যাহা নাহি পায়
তাহারে মিলায়।
উপমা তুলনা যত ভিড় করে আসে
ছন্দের কেন্দ্রের চারি পাশে,
কুমোরের ঘুর-খাওয়া চাকার সংবেগে
যেমন বিচিত্র রূপ উঠে জেগে জেগে।
বসন্তে নাগকেশরের সুগন্ধে মাতাল
বিশ্বের জাদুর মঞ্চে রচে সে আপন ইন্দ্রজাল।
বনতলে মর্মরিয়া কাঁপে সোনাঝুরি;
চাঁদের আলোর পথে খেলা করে ছায়ার চাতুরী;
গভীর চৈতন্যলোকে
রাঙা নিমন্ত্রণলিপি দেয় লিখি কিংশুকে অশোকে;
হাওয়ায় বুলায় দেহে অনামীর অদৃশ্য উত্তরী,
শিরায় সেতার উঠে গুঞ্জরি গুঞ্জরি।

এই যারে মায়ারথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে

সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা হতে আসে মন্ত্র এই সাধনার।
রক্তস্রোত-আন্দোলনে জেগে
ধ্বনি উচ্ছ্বসিয়া উঠে অর্থহীন বেগে।
প্রচ্ছন্ন নিকুঞ্জ হতে অকস্মাৎ ঝঞ্ঝায় আহত
ছিন্ন মঞ্জরীর মতো
নাম এল ঘূর্ণিবায়ে ঘুরি ঘুরি,
চাঁপার গন্ধের সাথে অন্তরেতে ছড়ালো মাধুরী।

[২১ চৈত্র] চৈত্রপূর্ণিমা ১৩৪৫
[শান্তিনিকেতন]

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

পাকুড়তলীর মাঠে
বামুন-মারা দিঘির ঘাটে
আদিবিশ্ব-ঠাকুরমায়ের আস্‌মানি এক চেলা
ঠিক ত্বক্ষুর বেলা
বেগ্‌নি-সোনা দিক্‌-আঙিনার কোণে
ব'সে ব'সে ভুঁইজোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।
সেখান থেকে ঝাপসা স্মৃতির কানে আসে
ঘুম-লাগা রোদ্‌দুরে
ঝিম্‌ঝিমিনি সুরে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে,
সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাতদলের মেলে।'

সুদূর কালের দারুণ ছড়াটিকে
স্পষ্ট করে দেখি নে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পথে ডাকাত এসে হরণ করলে মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।

দুঃসহ দিন দুঃখেতে বিক্ষত
এই-কটা তার শব্দমাত্র দৈবে রইল বাকি,
আগুন-নেভা ছাইয়ের মতন ফাঁকি।
সেই মরা দিন কোন্ খবরের টানে
পড়ল এসে সজীব বর্তমানে।
তপ্ত হাওয়ার বাজপাখি আজ বারে বারে
ছোঁ মেরে যায় ছড়াটারে,
এলোমেলো ভাবনাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে
টুক্‌রো করে ওড়ায় ধ্বনিটাকে।
জাগা মনের কোন্ কুয়াশা স্বপ্নেতে যায় ব্যেপে,
ধোঁয়াটে এক কম্বলেতে ঘুমকে ধরে চেপে,
রক্তে নাচে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
ঢঙ্‌ঢঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

বিকেলবেলার চিকন আলোর আভাস লেগে
ঘোলা রঙের আলস ভেঙে উঠি জেগে।
হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি
পাঁজরগুলোর তলায় তলায় ব্যথা হানি।
চটকা ভাঙে যেন খোঁচা খেয়ে—

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—
ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম,
সামান্য তার দাম,
ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা,
আনির স্থলে দিতেম তাকে চার-আনিটা।
ওই-যে অন্ধ কলু বুড়ির কান্না শুনি—
কদিন হল জানি নে কোন্ গোঁয়ার খুনি
সমর্থ তার নাতনিটিকে
কেড়ে নিয়ে ভেগেছে কোন্ দিকে।
আজ সকালে শোনা গেল চৌকিদারের মুখে,
যৌবন তার দ'লে গেছে, জীবন গেছে চুকে।
বুক-ফাটানো এমন খবর জড়ায়
সেই সেকালের সামান্য এক ছড়ায়।
শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে—
'উপায় নাই রে নাই প্রতিকার' বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।'

জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়,
চঙ্‌চঙিয়ে ঘণ্টা দোলে গলায়।

২৮।৩।৩৭

শান্তিনিকেতন

তর্ক

নারীকে দিবেন বিধি পুরুষের অন্তরে মিলায়ে
সেই অভিপ্রায়ে
রচিলেন সূক্ষ্মশিল্পকারুময়ী কায়া—
তারি সঙ্গে মিলালেন অঙ্গের অতীত কোন্ মায়া
যারে নাহি যায় ধরা,
যাহা শুধু জাদুমন্ত্রে ভরা,
যাহারে অন্তরতম হৃদয়ের অদৃশ্য আলোকে
দেখা যায় ধ্যানাবিষ্ট চোখে,
ছন্দোজালে বাঁধে যার ছবি
না-পাওয়া বেদনা দিয়ে কবি।
যার ছায়া সুরে খেলা করে
চঞ্চল দিঘির জলে আলোর মতন থরথরে।
নিশ্চিত পেয়েছি ভেবে যারে
অবুঝ আঁকড়ি রাখে আপন ভোগের অধিকারে,
মাটির পাত্রটা নিয়ে বঞ্চিত সে অমৃতের স্বাদে,
ডুবায় সে ক্লান্তি-অবসাদে
সোনার প্রদীপ শিখা-নেভা।
দূর হতে অধরাকে পায় যে বা
চরিতার্থ করে সেই কাছের পাওয়ারে,
পূর্ণ করে তারে।

তর্ক

নারীস্তব শুনালেম। ছিল মনে আশা—
উচ্চতত্ত্বে-ভরা এই ভাষা
উৎসাহিত করে দেবে মন ললিতার,
পাব পুরস্কার।
হায় রে, দুর্‌গ্রহগুণে
কাব্য শুনে
ঝক্‌ঝকে হাসিখানি হেসে
কহিল সে, 'তোমার এ কবিত্বের শেষে
বসিয়েছ মহোন্নত যে-কটা লাইন
আগাগোড়া সত্যহীন।
ওরা সব-কটা
বানানো কথার ঘটা,
সদরেতে যত বড়ো, অন্দরেতে ততখানি ফাঁকি।
জানি না কি—
দূর হতে নিরামিষ সাত্ত্বিক মৃগয়া,
নাই পুরুষের হাড়ে অমায়িক বিশুদ্ধ এ দয়া।'
আমি শুধালেম, 'আর, তোমাদের?'
সে কহিল, 'আমাদের চারি দিকে শক্ত আছে ঘের
পরশ-বাঁচানো,
সে তুমি নিশ্চিত জানো।'
আমি শুধালেম, 'তার মানে?'

সে কহিল, 'আমরা পুষি না মোহ প্রাণে,
কেবল বিশুদ্ধ ভালোবাসি।'
কহিলাম হাসি,
'আমি যাহা বলেছিনু সে কথাটা মস্ত বড়ো বটে,
কিন্তু তবু লাগে না সে তোমার এ স্পর্ধার নিকটে।
মোহ কি কিছুই নেই রমণীর প্রেমে।'
সে কহিল একটুকু থেমে,
'নেই বলিলেই হয়। এ কথা নিশ্চিত—
জোর করে বলিবই—
আমরা কাঙাল কভু নই।'
আমি কহিলাম, 'ভদ্রে, তা হলে তো পুরুষের জিত।'
'কেন শুনি'
মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলিল তরুণী।
আমি কহিলাম, 'যদি প্রেম হয় অমৃতকলস,
মোহ তবে রসনার রস।
সে সুধার পূর্ণ স্বাদ থেকে
মোহহীন রমণীরে প্রবঞ্চিত বলো করেছে কে।
আনন্দিত হই দেখে তোমার লাবণ্যভরা কায়া,
তাহার তো বারো-আনা আমারি অন্তরবাসী মায়া।
প্রেম আর মোহে
একেবারে বিরুদ্ধ কি দোঁহে।

তর্ক

আকাশের আলো
বিপরীতে-ভাগ-করা সে কি সাদা কালো।
ওই আলো আপনার পূর্ণতারে চূর্ণ করে
দিকে দিগন্তরে,
বর্ণে বর্ণে,
তৃণে শস্যে পুষ্পে পর্ণে,
পাখির পাখায় আর আকাশের নীলে,
চোখ ভোলাবার মোহ মেলে দেয় সর্বত্র নিখিলে।
অভাব যেখানে এই মন ভোলাবার
সেইখানে সৃষ্টিকর্তা বিধাতার হার।
এমন লজ্জার কথা বলিতেও নাই—
তোমরা ভোল না শুধু ভুলি আমরাই।
এই কথা স্পষ্ট দিনু কয়ে,
সৃষ্টি কভু নাহি ঘটে একেবারে বিশুদ্ধেরে লয়ে।
পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।
এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ—
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে,
পড়ে থাকে তীরে।

পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহতরী বেয়ে তাই সুধাসাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।
অমৃতের পাত্র তার ভরে ওঠে কানায় কানায়
স্বল্প জানা ভূরি অজানায়।'

কোনো কথা নাহি ব'লে
সুন্দরী ফিরায়ে মুখ দ্রুত গেল চলে।
পরদিন বটের পাতায়
গুটিকত সদ্যফোটা বেলফুল রেখে গেল পায়।
বলে গেল, 'ক্ষমা করো, অবুঝের মতো
মিছেমিছি বকেছিনু কত।'

ঢেলা আমি মেরেছিনু চৈত্রে-ফোটা কাঞ্চনের ডালে,
তারি প্রতিবাদে ফুল ঝরিল এ স্পর্ধিত কপালে
নিয়ে এই বিবাদের দান
এ বসন্তে চৈত্র মোর হল অবসান।

[এপ্রিল ১৯৩৯]

ময়ূরের দৃষ্টি

দক্ষিণায়নের সূর্যোদয় আড়াল ক'রে
সকালে বসি চাতালে।
অনুকূল অবকাশ ;
তখনো নিরেট হয়ে ওঠে নি কাজের দাবি,
ঝুঁকে পড়ে নি লোকের ভিড়
পায়ে পায়ে সময় দলিত করে দিয়ে।
লিখতে বসি,
কাটা খেজুরের গুঁড়ির মতো
ছুটির সকাল কলমের ডগায় চুঁইয়ে দেয় কিছু রস

আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
পাশের রেলিংটির উপর।
আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
এখানে আসে না তার বেদরদী শাসনকর্তা বাঁধন হাতে।
বাইরে ডালে ডালে কাঁচা আম পড়েছে ঝুলে,
নেবু ধরেছে নেবুর গাছে,
একটা একলা কুড়চিগাছ
আপনি আশ্চর্য আপন ফুলের বাড়াবাড়িতে!

প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্যে

ময়ূরটি ঘাড় বাঁকায় এদিকে ওদিকে।

তার উদাসীন দৃষ্টি

কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায়;

করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা;

তা হলে নগণ্য মনে করত না কবিকে।

হাসি পেল ওর ওই গম্ভীর উপেক্ষায়,

ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।

দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য

সমস্ত নীল আকাশে,

কাঁচা-আম-ঝোলা গাছের পাতায় পাতায়,

তেঁতুলগাছের গুঞ্জনমুখর মৌচাকে।

ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে

এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে

কবি লিখেছিল কবিতা,

বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।

কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,

কাঁচা আম ঝুলে পড়েছে ডালে।

নীল আকাশ থেকে শুরু করে সবুজ পৃথিবী পর্যন্ত

কোথাও ওদের দাম যাবে না কমে।

আর, মাহেন্দজারোর কবিকে গ্রাহ্যই করলে না

পথের ধারের তৃণ, আঁধার রাত্রের জোনাকি।

নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবীতে
মেলে দিলাম চেতনাকে,
টেনে নিলেম প্রকৃতির ধ্যান থেকে বৃহৎ বৈরাগ্য
আপন মনে ;
খাতার অক্ষরগুলোকে দেখলুম
মহাকালের দেয়ালিতে
পোকার ঝাঁকের মতো।
ভাবলুম, আজ যদি ছিঁড়ে ফেলি পাতাগুলো
তা হলে পর্শুদিনের অন্ত্যসংকার এগিয়ে রাখব মাত্র।

এমন সময় আওয়াজ এল কানে,
'দাদামশায়, কিছু লিখেছ না কি।'
ওই এসেছে— ময়ূর না,
ঘরে যার নাম সুনয়নী,
আমি যাকে ডাকি শুনায়নী ব'লে।
ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি
সকলের আগে।
আমি বললেম, 'সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।'
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, 'আচ্ছা, তাই সই।'

সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে, 'তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।'
ব'লে গলা ধরলে জড়িয়ে।
আমি বললেম, 'কবিত্বের রঙ লাগিয়ে নিচ্ছ
কবিকণ্ঠ থেকে তোমার বাহুতে ?'
সে বললে, 'অকবির মতো হল তোমার কথাটা ;
কবিত্বের স্পর্শ লাগিয়ে দিলেম তোমারই কণ্ঠে,
হয়তো জাগিয়ে দিলেম গান।'
শুনলুম নীরবে, খুশি হলুম নিরুত্তরে।
মনে-মনে বললুম, প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতারা।
সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাটকালের বৈরাগ্য

মাহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

[এপ্রিল ১৯৩৯]

কাঁচা আম

তিনটে কাঁচা আম পড়ে ছিল গাছতলায়
চৈত্রমাসের সকালে মৃদু রোদ্দুরে।
যখন দেখলুম, অস্থির ব্যগ্রতায়
হাত গেল না কুড়িয়ে নিতে।
তখন চা খেতে খেতে মনে ভাবলুম
বদল হয়েছে পালের হাওয়া,
পুবদিকের খেয়ার ঘাট ঝাপসা হয়ে এল।
সেদিন গেছে যেদিন দৈবে-পাওয়া দুটি-একটি কাঁচা আম
ছিল আমার সোনার চাবি,
খুলে দিত সমস্ত দিনের খুশির গোপন কুঠুরি;
আজ সে তালা নেই, চাবিও লাগে না।

গোড়াকার কথাটা বলি।
আমার বয়সে এ বাড়িতে যেদিন প্রথম আসছে বউ
পরের ঘর থেকে,
সেদিন যে-মনটা ছিল নোঙর-ফেলা নৌকো
বান ডেকে তাকে দিলে তোলপাড় ক'রে।
জীবনের বাঁধা বরাদ্দ ছাপিয়ে দিয়ে
এল অদৃষ্টের বদান্যতা।

পুরোনো ছেঁড়া আটপৌরে দিনরাত্রিগুলো
খসে পড়ল সমস্ত বাড়িটা থেকে।
কদিন তিনবেলা রোশনচৌকিতে
চার দিকের প্রাত্যহিক ভাষা দিল বদলিয়ে;
ঘরে ঘরে চলল আলোর গোলমাল
ঝাড়ে লণ্ঠনে।
অত্যন্ত পরিচিতের মাঝখানে
ফুটে উঠল অত্যন্ত আশ্চর্য।
কে এল রঙিন সাজে সজ্জায়,
আলতা-পরা পায়ে পায়ে—
ইঙ্গিত করল যে, সে এই সংসারের পরিমিত দামের মানুষ নয়-
সেদিন সে ছিল একলা অতুলনীয়।
বালকের দৃষ্টিতে এই প্রথম প্রকাশ পেল—
জগতে এমন কিছু যাকে দেখা যায় কিন্তু জানা যায় না।
বাঁশি থামল, বাণী থামল না—
আমাদের বধূ রইল
বিস্ময়ের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ঘেরা।
তার ভাব, তার আড়ি, তার খেলাধুলো ননদের সঙ্গে।
অনেক সংকোচে অল্প একটু কাছে যেতে চাই,
তার ডুরে শাড়িটি মনে ঘুরিয়ে দেয় আবর্ত;
কিন্তু, ভ্রূকুটিতে বুঝতে দেরি হয় না, আমি ছেলেমানুষ,
আমি মেয়ে নই, আমি অন্য জাতের।

কাঁচা আম

তার বয়স আমার চেয়ে দুই-এক মাসের
বড়োই হবে বা ছোটোই হবে।
তা হোক, কিন্তু এ কথা মানি,
আমরা ভিন্ন মসলায় তৈরি।
মন একান্তই চাইত ওকে কিছু একটা দিয়ে
সাঁকো বানিয়ে নিতে।
একদিন এই হতভাগা কোথা থেকে পেল
কতকগুলো রঙিন পুঁথি ;
ভাবলে চমক লাগিয়ে দেবে।
হেসে উঠল সে ; বলল,
'এগুলো নিয়ে করব কী।'
ইতিহাসের উপেক্ষিত এই-সব ট্র্যাজেডি
কোথাও দরদ পায় না,
লজ্জার ভারে বালকের সমস্ত দিনরাত্রির
দেয় মাথা হেঁট ক'রে।
কোন্ বিচারক বিচার করবে যে, মূল্য আছে
সেই পুঁথিগুলোর।

তবু এরই মধ্যে দেখা গেল, শস্তা খাজনা চলে
এমন দাবিও আছে ওই উচ্চাসনার—
সেখানে ওর পিঁড়ে পাতা মাটির কাছে।

ও ভালোবাসে কাঁচা আম খেতে
শুল্পো শাক আর লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে।
প্রসাদলাভের একটি ছোট্ট দরজা খোলা আছে
আমার মতো ছেলে আর ছেলেমানুষের জন্যেও

গাছে চড়তে ছিল কড়া নিষেধ।
হাওয়া দিলেই ছুটে যেতুম বাগানে,
দৈবে যদি পাওয়া যেত একটিমাত্র ফল
একটুখানি দুর্লভতার আড়াল থেকে,
দেখতুম, সে কী শ্যামল, কী নিটোল, কী সুন্দর,
প্রকৃতির সে কী আশ্চর্য দান।
যে লোভী চিরে চিরে ওকে খায়
সে দেখতে পায় নি ওর অপরূপ রূপ।

একদিন শিলবৃষ্টির মধ্যে আম কুড়িয়ে এনেছিলুম ;
ও বলল, 'কে বলেছে তোমাকে আনতে।'
আমি বললুম, 'কেউ না।'
ঝুড়িসুদ্ধ মাটিতে ফেলে চলে গেলুম।
আর-একদিন মৌমাছিতে আমাকে দিলে কামড়ে ;
সে বললে, 'এমন ক'রে ফল আনতে হবে না।'
চুপ করে রইলুম।

কাঁচা আম

বয়স বেড়ে গেল।
একদিন সোনার আংটি পেয়েছিলুম ওর কাছ থেকে ;
তাতে স্মরণীয় কিছু লেখাও ছিল।
স্নান করতে সেটা পড়ে গেল গঙ্গার জলে,
খুঁজে পাই নি।
এখনো কাঁচা আম পড়ছে খসে খসে
গাছের তলায়, বছরের পর বছর।
ওকে আর খুঁজে পাবার পথ নেই।

৮।৪।৩৯

[শান্তিনিকেতন]